একাকিত্ব

একাকিত্ব হলো একধরণের নেতিবাচক আবেগীয় অবস্থা যা সমাজ বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে বা সঙ্গী-সাথীর অভবে তৈরী হয়। ফলে ব্যক্তি নৈকট্য অনুভব করেনা এবং তার মধ্যে সমাজ বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি তৈরী হয়। ব্যক্তি অনুভব করেন যে তিনি এখন যেমন একাকি আছেন ভবিষ্যতেও যেন তেমনি তাকে একা থাকতে হবে। অনেক মানুষের মধ্যে থেকেও কিন্তু একাকিত্বের অনুভূতি তৈরী হতে পারে। নিজেকে একা ভাবলেই একা। মানুষ আছে কি নেই সেটা মূখ্য নয়। একাকিত্ব সামাজিক, মানসিক ও আবেগীয় কারণে তৈরী হতে পারে। সকল সমাজে সকল স্তরের মানুষের মধ্যেই একাকিত্ব তৈরী হতে পারে। একাকিত্বকে এক ধরণের সামাজিক যন্ত্রণা বা অস্বস্তি বলা যায়। এর সাহায্যে ব্যক্তি সজাগ হয় যে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে এবং তখন সে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়। এই অর্থে এটি ক্ষুধার মতো। ক্ষুধা পায় বলেই আমরা খাদ্য জোগাড়ে আগ্রহী হই ও খাবার খাই। একই ভাবে কেউ যখন একাকিত্ব অনুভব করে তখন সে অন্য মানুষের সাথে গল্প করতে আগ্রহী হয়। একাকিত্বের ভাল প্রভাবও আছে। কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী, আর্টিষ্ট এরা অনেকে বলেন যে একাকিত্ব তাদের সৃষ্টিশীলতা বাড়ায়। মানুষ অল্প সময়ের জন্য একাকিত্বে ভুগতে পারে। যেমন, অসুখ বা অন্য কোন কারণে কেউ হয়তো অন্যদের সাথে কিছুদিন দেখা করতে পারলোনা। সুস্থ হয়ে সে আবার মানুষের সাথে মিশতে শুরু করলো। আবার একাকিত্ব দীর্ঘ সময়ের জন্যও হতে পারে। এধরণের একাকিত্ব সহসা দূর হয়না। ব্যক্তি তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে একা বোধ করে। এই ধরণের মানুষ অনেক মানুষের মধ্যে থেকেও নৈকট্য বোধ করতে অক্ষম হয়।

একাকিত্বের উপর বাংলাদেশে তেমন গবেষণালব্ধ তথ্য নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত গবেষণার তথ্যে দেখা যায় সে দেশের ষাট মিলিয়ন অর্থাৎ জনসংখ্যার শতকরা বিশ ভাগ মানুষ একাকিত্বে ভুগছে। গবেষণায় দেখা যায় যে শতকরা বার ভাগ মার্কিনীর কথা বলার বা সময় ব্যয় করার মতো কেউ নেই। ২০০৬ সালে করা আরেক গবেষণায় দেখা যায় যে, মার্কিনীদের গড়ে দুই জন করে বন্ধু বা সাথী আছে যাদের উপর তারা আস্থা রাখতে পারে। ১৯৮৫ সালে এই সংখ্যা ছিল তিনজন। যাদের ঘনিষ্ঠ কেউ নেই তাদের সংখ্য ১০% থেকে বেড়ে ২৫% হয়েছে। এছাড়া আরো ১৯% বলেছে তাদের একজন মাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে। প্রায়ই এরা তাদের স্বামী বা স্ত্রী। এরা কেউ তাদের ছেড়ে গেলে বা মরে গেলে তারা সম্পূর্ণ একা হয়ে যাবে।

নানা কারণে একাকিত্ব তৈরী হয়। শৈশব বা কৈশোরে বন্ধুর অভাবে বা জীবনে অপরিহার্য এমন মানুষের (যেমন, বাবা-মা) মানুষ একাকিত্বে ভুগে। আবার এটি অন্য কোন সামাজিক সমস্যা অথবা মানসিক রোগের লক্ষণও হতে পারে। ভালোবাসার সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলে, কেউ ত্যাগ করে চলে গেলে, দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ভেঙ্গে গেলে মানুষ একা হয়ে যায়। জীবনের জন্য অপরিহার্য মানুষ চলে গেলে মনের মধ্যে শোক বা কষ্ট আসে। তখন পাশে অন্য মানুষ থাকলেও একা লাগে। বাচ্চা জন্ম নেয়ার পর পর একাকিত্বের অনুভূতি তৈরী হতে পারে। পোস্টপারটাম ডিপ্রেশনের প্রভাবে এটা হয়।

বিবাহ বা জীবনে এধরণের বড় পরিবর্তনের পর পর একা লাগতে পারে। কারণ এটি জীবনে একটা বড় পরিবর্তন আনে। পরিচিত মানুষ-জন ছেড়ে নতুন বাসায় গিয়ে থাকতে হয়। নিজের পরিবারের মানুষ জন বিবাহিত সদস্যকে নতুন দৃষ্টিতে দেখে। আগের জীবন আর ফিরে আসেনা। বিবাহ বা পারিবারিক জীবন যদি অশান্তিময় হয় তবে মনে একধরণের রাগ ও আপসোস থাকে। ফলে ভালোবাসার সম্পর্ক ঠিকমতো কাজ করেনা। একা লাগে। যৌন জীবনের সূচনা বা অবসান, বাড়ি বদল, কছুদিনের জন্য কোথাও গিয়ে থাকতে হলে একা লাগতে পারে।

অনেকের মানুষের সাথে আলাপচারিতা ও ভাব বিনিময় করার দক্ষতা কম থাকে। ফলে তারা লোকসমাজে ঠিকমতো মিশতে না পেরে একাকিত্বে ভুগে। কেউ যদি এমন এলাকায় বাস করে যেখানে মানুষ কম থাকে তবে তার একাকি লাগতে

পারে। কথা বলার মতো মানুষ থাকেনা। বিশেষতঃ কম জনবসতিপূর্ণ এলাকায় এটি হতে পারে। বৃদ্ধমানুষদের পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়। জ্বরা-ব্যাধিতে তাদের ভ্রমণ করার ক্ষমতা কমে যায়। পুরোপুরি একা হয়ে পড়ে তারা। আবদ্ধ হয়ে যায় নিজের ঘরে।

অনেকসময় দলের একজনের মধ্যে একাকিত্বের অনুভূতি থাকলে অন্যদের মধ্যে এই অনুভূতি সংক্রমিত হয়ে যায়। ১০ বছর ধরে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে যে যাদের ঘনিষ্ঠজনের মধ্যে কেউ একাকিত্বে ভুগছেন তাদের নিজেদেরও একাকিত্বে ভোগার সম্ভাবনা ৫২%। বংশগতিও একাকিত্বের জন্য অনেকাংশে দায়ী। কারো কারো জন্মগতভাবেই একাকিত্বের অনুভূতি বেশী থাকে।

আধুনিক সভ্যতার প্রসারের সাথে সাথে সারা পৃথিবীতেই একাকিত্বের ব্যাপক বিস্তার হয়েছে। আধুনিক যুগে দেশান্তর গমনের হার অনেক বেড়েছে। আদি নিবাস ছেড়ে, পৈর্তৃক ভিটা ছেড়ে, আত্মীয়-বন্ধু ছেড়ে, সমাজ ও ধর্মের সংস্পর্শ ছেড়ে দূর দেশে ভিন্ন ধরণের মানুষের মধ্যে থকতে হচ্ছে। এতদিনের পরিচিত পরিবেশও মানুষদের জন্য মনে একধরণের বেদনা জেগে উঠে। আশেপাশের মানুষগুলোর ভাষা আলাদা। সামাজিক আচার-আচরণ আলাদা। গল্প করার মানুষ নেই।

পরিবার গুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী ও এক বা দুইজন সন্তান নিয়ে পরিবার। দাদা-দাদী, মামা-চাচা সাথে থাকেনা। স্বামী-স্ত্রী জীবিকার টানে দুজনই কাজ করে। সন্তান বড় হলো। পড়ার জন্য বা চাকুরীর জন্য দূরে চলে গেল। জীবন অনেক গতিময় হয়েছে। সময় কাটে পত্রিকার পৃষ্ঠায়, বইয়ের পাতায়, ওয়েব পেজে, নেট ভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ এমএসএন, টুইটার ইত্যাদিতে। মোবাইলে খবর পৌছে যায় মুহুর্তেই। ডাকবিভাগকে প্রতিস্থাপিত করেছে ই-মেইল। কোথায় হারিয়ে গেল রক্তমাংসের মানুষগুলো আর তাদের হাসি-কান্না। সাইবারপৃথিবীতে ভেসে আসে লেখা ও ছবি, ভেসে আসে আবেগ প্রকাশক প্রতীকগুলো। ভেসে আসে অশরীরি অচেনা কণ্ঠগুলো। এর হাত ধরে উঠে আসছে একাকিত্ব। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা কতটুকু একাকিত্বে ভুগেন সে বিষয়ক গবেষণায় পরস্পরবিরোধী ফল পাওয়া গেছে। কোন কোন গবেষণায় ইন্টারনেট মানুষকে একা করে ফেলে এমনটা পাওয়া গেছে, কোন কোন গবেষণায় উল্টো ফল পাওয়া গেছে। এক গবেষণায় দেখা যায় যে, যারা নেটে নতুন বন্ধু খুজে তারা অধিক হারে একাকিত্বে ভুগে। কিন্তু যারা নেটে পুরাতন বন্ধুদের সংস্পর্শে থাকে তাদের একাকিত্বের অনুভূতি কমে যায়। ২০০২ এবং ২০১০ সালে পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায় যে ইন্টারনেট ব্যবহার করলে বিষন্নতা ও একাকিত্ব তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে এবং প্রত্যক্ষিত সামাজিক সমর্থন ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।

আধুনিক অফিসগুলোর আবহাওয়া এমন যে শুধু ব্যবসাটাই গুরুত্ব পায়। হারিয়ে যায় ব্যক্তির পরিচয় ও গুরুত্ব। ফলে যারা এরমধ্যেই একাকিত্বে ভুগছে তাদের জন্য এই পরিবেশটি হলো তাদেরকে অবহেলা করার সামিল। তাদের জন্য এটি আরো একাকিত্বকে বাড়িয়ে দেয়। যারা কাজ বা অন্য কোন কারণে নিয়মিত দীর্ঘ ভ্রমণ করেন তারা একাকিত্বে ভুগেন।

একাকিত্বের শারীরিক ও মানসিক প্রভাব বেশ ক্ষতিকর। একাকিত্ব বিষন্নতা রোগের সাথে জড়িত। এটি আত্মহত্যার ঝুঁকি বাড়ায়। এছাড়া এটি অ্যালকোহল ও অন্যান্য মাদকাসক্তি বাড়িয়ে দেয়। একাকিত্বের সাথে স্কিজোটাইপাল ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য জড়িত থাকতে দেখা যায়। যারা জনবিচ্ছিন্ন থাকে তাদের ঘুমের সমস্যা হয়, তারা একধরণের ক্লান্তি বোধ করে ও দৈনন্দিন স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ চালাতে সমস্যার সম্মুখীন হয়। একাকি মানুষগুলো পৃথিবীকে ভিন্নভাবে দেখে, অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা থাকে। তারা মানসিক চাপে বেশী আক্রান্ত হয়। তাদের মধ্যে সমাজ বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি থাকে। তারা অনুভব করে যেন তারা সমাজ থেকে বহিষ্কৃত। সমাজ বিচ্ছিন্ন শিশুদের মধ্যে সমাজবিরোধী ও আত্মবিধ্বংসী আচরণ দেখা যায়। এদের মধ্যে আক্রমণাত্মক ও কিশোরঅপরাধমূলক আচরণ বেশী দেখা যায়। সমাজ বিচ্ছিন্নতার কারণে শিশু ও বড় দুই দলের মধ্যেই শিক্ষণ ও স্মৃতিশক্তির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এটি মানুষের সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতার ক্ষতি করে।

যারা একাকিত্বে ভুগে তাদের শারীরিক স্বাস্থ্যও খারাপ থাকে। ২০০৫ সালে পরিচালিত আমেরিকান ফার্মিংহাম হার্ট স্টাডিতে দেখা যায় যে একাকি মানুষদের রক্তে ইন্টারলিউকিন -৬ (আই.এল. সিক্স) নামের একধরণের রাসায়নিক বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় যা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। একাকিত্বের কারণে স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়ে। পঞ্চাশোর্ধ একাকী মানুষদের রক্তচাপ ত্রিশপয়েন্ট বেশী পাওয়া যায় (ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো, ২০০৬)। যেসব রোগীদের পারিবারিক ও সামজিক দৃঢ় সমর্থন আছে তাদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবার ফল ভাল পাওয়া যায়। গবেষণাটিতে দেখা যায় যে একাকিত্ব জ্ঞানীয় বা চিন্তার ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির ক্ষতি করে এবং রক্তচাপ বাড়ায়। একাকিত্বে ভোগা মানুষগুলো শরীরচর্চা কম করে।

মানুষের শরীরে যে সব ভাইরাস সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয় থাকে সেগুলো একাকিত্বের কারণে অধিক হারে স্বক্রিয় হয়ে উঠে। একাকী মানুষদের হার্পিস নামের ভাইরাসটি নানা ভাবে ক্ষতি করে। একবার সংক্রমিত হলে এই ভাইরাস সারাজীবন বহন করতে হয়। একাকি মানুষগুলোর মানসিক চাপের প্রতিক্রিয়ায় শারীরিক এমন ধরণের পরিবর্তন আসে যার ফলে বয়সের সাথে জড়িত রোগগুলো অধিক ক্ষতি করে। একাকিত্ব মস্তিষ্কের ক্রিয়াদি ক্ষতিগ্রস্থ করে ও অ্যালঝেইমারস রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এটি অকালবার্ধক্য ডেকে আনে। এককিত্বের প্রভাবে শরীরের তাপমাত্রা কমে যেতে পারে।

একাকিত্ব, সমাজ বিচ্ছিন্নতা ও বিষন্নতার নানা রকম চিকিৎসা আছে। কগনেটিভ বিহেভিয়র থেরাপি ও অন্যান্য সাইকোলজিক্যাল থেরাপি এক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। এই ধরণের চিকিৎসায় চিন্তার ধরণ বদলে ফেলে একাকিত্ব দূর করতে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে ব্যক্তিকে উৎসাহিত করা হয়। যুক্তি দিয়ে নেতিবাচক চিন্তা দূর করতে উৎসাহিত করা হয়। যে সমস্যাগুলো সমাধানযোগ্য তা সমাধান করতে ও যেগুলো সমাধান অযোগ্য সেগুলো মেনে নিয়ে জীবন চালিয়ে নিতে উৎসাহিত হয় ব্যক্তি। সাইকোলজিষ্টরা এই ধরণের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন।

এছাড়া গ্রুপ সাইকোথেরাপি, বিশেষতঃ একা মানুষগুলোর সমণ্বয়ে গঠিত সেল্প হেল্প গ্রুপগুলো এক্ষেত্রে বেশ ফলপ্রসু হয়।

যাদের তীব্রভাবে একাকিত্বের অনুভূতি আছে তাদের জন্য ডাক্তারেরা অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট জাতীয় ঔষধ দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে মনে রাখবেন, কখনোই নিজে নিজে ঔষধ ব্যবহার শুরু করবেননা। এর অনেক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হতে পারে। প্রয়োজনে ডাক্তার দেখান।

তীব্র বিষন্নতার ও একাকিত্বের চিকিৎসায় মানসিক ডাক্তারেরা মাথায় নিয়ন্ত্রিত কারেন্টের শক দিয়ে চিকিৎসা দেন। এই চিকিৎসাকে বলে ইলেক্ট্রো কনভালসিভ থেরাপি বা ইসিটি। তীব্র বিষন্নতা, পোস্ট পার্টাম ডিপ্রেশন বা সাইকোসিস ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসিটি ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া গেছে।

শরীরচর্চা করলে, খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করলে, পশু-পাখি পুষলে, সুন্দর স্মৃতি রোমন্থন করলে, ধর্ম চর্চা করলে একাকিত্বের অনুভূতি কমে।

ব্যক্তি নিজেও তার একাকিত্ব কমাতে অনেকটা উদ্যেগী হতে পারে। প্রথমেই বুঝতে হবে তার একাকিত্ব আছে কিনা, থাকলে এটি তার কি কি শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি করছে সে বিষয়টি। এরপর এটি দূর করার জন্য তাকে সামাজিক সম্পর্ক গুলো ঝালাই করতে হবে, নতুন বন্ধুত্ব ও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। যাদের সাথে মন-মনসিকতা মিলে তাদের সাথে খাতির বাড়াতে হবে। সম্ভব হলে কোন সামজিক কর্মে যুক্ত হতে হবে। তাতে একাকিত্ব ঘুচবার সম্ভাবনা বাড়বে। মনের নেতিবাচক চিন্তাগুলো কমাতে হবে। অগ্রিম চিন্তা বাদ দিতে হবে। ভবিষ্যতে ভাল কিছু হবে এমন আশা পোষন করতে হবে। যে সময়টা একা কাটাতেই হচ্ছে সে সময়টাতে আনন্দের কিছু করার চেষ্টা করতে হবে। গান শোনা

যায়, বাগান করা যায়, মুভি দেখতে যাওয়া যায়। বাসায় এমন কিছু জিনিস যোগাড় করে রাখা যায় যাতে একা অনুভব করলে সেই কাজগুলো করা যায়। যেমন, হয়তো গান শোনার জন্য সিডি প্লেয়ার জোগাড় করে রাখলেন।

অনেকের মতে সম্মোহন বা হিপনোসিসও একাকিত্ব কমাতে সাহায্য করে।

সবশেষে এমন একটি পরিবেশ যদি সৃষ্টি করা যায় যেখানে একাকিত্বে ভোগা মানুষটির সাথে অন্যান্য মানুষদের নিয়মিত দেখা-স্বাক্ষাত হবে তবে একাকিত্ব কমে যাবে। এর সুবিধা এই যে, আত্মীয়-স্বজন নিজেরাই এটি তৈরী করতে পারেন। এরজন্য কোন পেশাদারী সহায়তা লাগছেনা। যদি কোন কারণে ব্যক্তি অতিরিক্ত বিষন্নতায় আক্রান্ত হয় তখন অবশ্য আগে মানসিক চিকিৎসা করিয়ে পরে সামাজিক মেলামেশার ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা তখন অনেকের মধ্যে থেকেও ব্যক্তি একা বোধ করে ও চেষ্টা করেও ঠিকমতো মিশতে পারেনা।

আসুন সবাই মিলে একাকিত্ব থেকে বের হয়ে আসি। কেউ একাকিত্বে ভুগলে তাকেও বের হতে সাহায্য করি। ছোটখাট কিছু উদ্যোগ আমাদের ভবিষ্যত অসুস্থতা থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে। আমাদের জীবনের মানও উন্নত করবে।

লেখকঃ মোঃ জহির উদ্দিন, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট, সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট। বর্তমান লেখাটির বিষয়ে মতামত জানাতে লেখককে মেইল করতে পারেন zahirm_bd@yahoo.com -এই ইমেইলে।